ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

(সার-সংক্ষেপ)

বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমারের নাগরিকদের (রোহিঙ্গা) বাংলাদেশে অবস্থানজনিত সমস্যা: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ বিষয়ক সমীক্ষা

নভেম্বর ২০১৭

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমারের নাগরিকদের বাংলাদেশে অবস্থানজনিত সমস্যা: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ বিষয়ক সমীক্ষা

গবেষণা উপদেষ্টা:

অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল

চেয়ারপারসন, ট্রাস্টি বোর্ড, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

ড. ইফতেখারুজ্জামান

নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের

উপদেষ্টা, এক্সিকিউটিভ ম্যানেজমেন্ট, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক:

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান

পরিচালক, রিসার্চ এন্ড পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

গবেষণা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন:

গোলাম মহিউদ্দিন, প্রোগ্রাম ম্যানেজার - গবেষণা, জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন, টিআইবি

জাফর সাদেক চৌধুরী, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ এন্ড পলিসি, টিআইবি

মো: রাজু আহম্মেদ মাসুম, এসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার- গবেষণা, জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন, টিআইবি

মো: জসিম উদ্দিন, এরিয়া ম্যানেজার, সিভিক এনগেজমেন্ট, টিআইবি

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও অংশীজন এবং তথ্য প্রদানকারীদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এম. জাকির হোসেন খান (সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন) এর প্রতি এই সমীক্ষার প্রতিটি ধাপে পর্যালোচনা ও মূল্যবান মতামত প্রদানের জন্য। কৃতজ্ঞতা তথ্য সংগ্রহে সহায়তাকারী দল এবং টিআইবি এর সহকর্মীদের প্রতি। প্রতিবেদনের উপস্থাপনার উপর মতামত দেয়ার জন্যে রিসার্চ ও পলিসি বিভাগ এবং গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশে সহায়তার জন্যে আউটরিচ ও কমিউনিকেশন বিভাগের সহকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা।

যোগাযোগ:

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

মাইডাস সেন্টার (চতুর্থ ও পঞ্চম তলা)

বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন), ২৭ (পুরাতন)

ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯

ফোন: ৮৮-০২-৯১২৪৭৮৮ ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯১২৪৯১৫

ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org

ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

সূচীপত্র

১. গবেষণার প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা ১

২. সমীক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ ২

৩. সমীক্ষার পরিধি ২

৪. তথ্যের উৎস, ধরণ ও তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ২

৫. গবেষণার ফলাফল ২

৫.১ অংশীজনদের দায়িত্ব এবং সমন্বয় ২

৫.২ সীমানা পারাপার এবং ক্যাম্পে আগমন ৩

৫.৩ আশ্রয়স্থল ৩

৫.৪ ত্রাণ ব্যবস্থাপনা ৩

৫.৫ খাদ্য ৪

৫.৬ বস্ত্র ৪

৫.৭ পানি সরবরাহ ও পয়:নিষ্কাশন ৪

৫.৮ স্বাস্থ্যসেবা ৪

৫.৯ প্রতিবন্ধী, অনাথ এবং শিশুদের জন্যে গৃহীত বিশেষ ব্যবস্থা ৪

৫.১০ নিরাপত্তা ৫

৫.১১ বায়োমেট্রিক নিবন্ধন ৫

৬. সামগ্রিক ব্যবস্থার ইতিবাচক দিকসমূহ ৫

৭. চ্যালেঞ্জসমূহ ৬

৭.১ সীমানা অতিক্রম, মুদ্রা বিনিময়, অবস্থান ও আশ্রয় নির্মাণ ৬

৭.২ ত্রাণ ব্যবস্থাপনা ও জীবন ধারণে সহায়তা (খাদ্য, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, পানিও পয়ঃনিষ্কাশন) ৬

৭.৩ নিরাপত্তা, নিবন্ধন ও অভিযোগ নিরসন ৬

৭.৪ পরিবেশগত প্রভাব ও বিপর্যয় ৭

৮. চলমান ও দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ৭

৯. সুপারিশসমূহ ৮

১. গবেষণার প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

বাংলাদেশের বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমারের নাগরিকদের (রোহিঙ্গা) অনুপ্রবেশ একটি ঐতিহাসিক এবং চলমান সংকট। এ সংকট শুধুমাত্র বাংলাদেশ মায়ানমার দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে না বর্তমানে এ সংকট জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং বহিঃর্বিশ্বের অনেক দেশের সরকার ও মানুষের উদ্বেগের বিষয় হিসেবে আলোচিত হচ্ছে। জাতিসংঘ ইতোমধ্যে রোহিঙ্গাদের বিশ্বের সবচেয়ে "নিগৃহীত জনগোষ্ঠী' হিসেবে মায়ানমার কর্তৃপক্ষের পরিচালিত এই সাম্প্রতিক নৃশংসতাকে "জাতিগত নিধন" হিসেবে চিহ্নিত করে। বাংলাদেশসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রচন্ড নিন্দার মধ্যেও এ নিধন চলমান রয়েছে এবং প্রতিদিনই বাংলাদেশে বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমারের নাগরিকদের (রোহিঙ্গা) সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৭৮ সালের প্রথম দিকে অপরেশান নাগমিন (ড্রাগন কিং) এর মাধ্যমে মায়ানমার সরকার রাখাইন এবং কাচিন রাজ্যে রোহিঙ্গা নাগরিকদের উপর দমন পীড়ন শুরু করে। এ দমন-পীড়নের প্রতিক্রিয়ায় প্রায় দুই লক্ষ মায়ানমারের নাগরিক বাস্তুচ্যুত হয়ে বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলায় আশ্রয় নেয়। সেই সময়ে আন্তর্জাতিক মহলের চাপে বাংলাদেশ ও মায়ানমার আলোচনার মাধ্যমে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের নিজ বাসভূমিতে ফেরত নেয়ার ব্যাপারে দ্বিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৭৮ সালের আগস্ট মাস থেকে ১৯৭৯ সাল নাগাদ ১ লাখ ৮০ হাজার রোহিঙ্গাকে মায়ানমারে ফেরত পাঠানো হয়েছিল। বাকি ২০ হাজার এর মধ্যে ১০,০০০ জন বিভিন্ন সময়ে মারা যায় এবং ১০ হাজার এর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

পরবর্তীতে ১৯৯১ সালে নিপীড়নের শিকার হয়ে পুনরায় প্রায় আড়াই লাখ আশ্রয়প্রার্থী বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে এবং পরিস্থিতি বিবেচনায় তখন বাংলাদেশ সরকার সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক পক্ষগুলোকে সঙ্গে নিয়ে রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে কাঠামোগত কিছু সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী হাতে নেয় এবং শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশন (RRRC) গঠন করে। এই কমিশনের সাহায্যে জাতিসংঘের শরনার্থী বিষয়ক হাই কমিশনের মধ্যস্থতায় ২ লাখা ৩০ হাজার শরনার্থীকে মায়ানমারে প্রত্যাবাসন করা সম্ভব হয়। ২০১২ সালের জুন থেকে অক্টোবরের মধ্যে নতুন করে সহিংসতার প্রেক্ষিতে ১ লাখা ২০ হাজার এবং একই সহিংসতার ধারাবাহিকতায় ২০১৪ সাল নাগাদ আরো ৮৭,০০০ নতুন আশ্রয়প্রার্থী বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে। ২০১৬ সালে মায়ানমার সামরিক বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত অভিযানের সময় নতুন করে পালিয়ে আসে আরো ৯০,০০০ এবং ২০১৭ সালে এর সঙ্গে যুক্ত হয় ৭৪,০০০ জন আশ্রয়প্রার্থী। সর্বশেষ চলতি বছরের আগস্ট মাসে মায়ানমারের রাখাইন রাজ্যে বড় ধরনের সামরিক অভিযানের প্রেক্ষিতে প্রায় ৫ লাখা ৩৬ হাজার রোহিঙ্গার অনুপ্রবেশ করে যা স্মরণকালের ভয়াবহতম অনুপ্রবেশ।

পূর্ব থেকে বাংলাদেশে অবস্থানরত চার লক্ষাধিক রোহিঙ্গার সাথে নতুন করে যুক্ত হওয়া পাঁচ লক্ষাধিক আশ্রয়প্রার্থীর ঢল বাংলাদেশের সীমান্তে মানবিক বিপর্যয় এবং জরুরি পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। শুধুমাত্র মানবিক দিক বিবেচনা করে বাংলাদেশ সরকার রোহিঙ্গাদের সাময়িক আশ্রয় দানের সিদ্ধান্ত নেয়। সরকার এবং বাংলাদেশের জনগণের তাৎক্ষনিক অকাতরে সাহায্য সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে মানবিক বিপর্যয়ের প্রাথমিক ধাপ অতিক্রম করা সম্ভব হয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এর অধিভূক্ত সরকারের বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী সংস্থাসমূহ সমন্বিতভাবে জরুরি ভিত্তিতে বিভিন্ন সেবা প্রদান শুরু করে। পরিস্থিতি মোকাবেলার গুরুত্ব অনুধাবন করে সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীকে যুক্ত করেছে। বাংলাদেশ সরকারের পাশাপাশি জাতিসংঘ এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ মানবিক সহায়তায় এগিয়ে এসেছে আসে এবং আশ্রয়প্রার্থীদের মানবিক সহায়তায় নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক অনুপ্রবেশটি সংখ্যাগত দিক থেকে বৃহৎ হওয়ায় এবং স্বল্প সময়ে হঠাৎ করে ঘটে যাওয়ার ফলে আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকা স্বত্তেও এই সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় বহুবিধ চ্যালেঞ্জ দেখা দেয়। বিশেষত নানা জরুরি বিষয়ে চাহিদার প্রেক্ষিতে যোগানে অপ্রতুলতা দেখা দেয়। এছাড়াও বাংলাদেশ সরকার সহ অন্যান্য অংশীজনরা এই সংকটে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে ত্রাণ যোগান এবং ব্যবস্থাপনায় মনোনিবেশ করায় বর্তমান জরুরি পরিস্থিতিতে নানাবিধ অপরাধ, নির্যাতন, অনিয়ম ও দুর্নীতির ঝুঁকির সম্ভাবনাসহ দীর্ঘমেয়াদে এই সংকটের কারণে বেশ কিছু ভবিষ্যৎ ঝুঁকি তৈরী হচ্ছে যা বাংলাদেশের মত স্বল্পোন্নত রাষ্ট্রের পক্ষে সমাধান করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) বর্তমান সংকট ব্যবস্থাপনায় সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতাসমূহ এবং সংকট মোকাবেলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের করণীয় সংক্রান্ত সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে এই সমীক্ষাটি গ্রহণ করেছে।

২. সমীক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ

এ সমীক্ষার লক্ষ্য- **বাংলাদেশে অবস্থানরত বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমারের নাগরিকদের (রোহিঙ্গা) ত্রাণ ও আশ্রয় ব্যবস্থাপনার ওপর একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিতকরণ**

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ:

- বাংলাদেশে অবস্থানরত বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমারের নাগরিকদের (রোহিঙ্গা) ত্রাণ ও আশ্রয় ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের কার্যক্রম ও সমন্বয় ব্যবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা
- রোহিঙ্গা নাগরিকদের জন্যে গৃহীত নানাবিধ উদ্যোগ এবং ত্রাণ ব্যবস্থাপনার সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা
- বিদ্যমান সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং এর উত্তরণে সুপারিশ প্রদান

৩. সমীক্ষার পরিধি

গবেষণাটিতে বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত আশ্রয়প্রার্থী মায়ানমারের নাগরিকদের (রোহিঙ্গা) বাংলাদেশের সীমান্তে প্রবেশ থেকে শুরু করে অস্থায়ী ক্যাম্প/শিবিরে পৌছানোর পদ্ধতি, মৌলিক চাহিদাসহ অন্যান্য সহয়তায় গৃহীত নানাবিধ উদ্যোগ, রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া, ত্রাণ ব্যবস্থাপনা, পরিবেশগত বিপর্যয়ের শংকা, সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের দায়িত্ব এবং সমন্বয়, নানাবিধ অপরাধ ও দুর্নীতির ঝুঁকির বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে।

৪. তথ্যের উৎস, ধরণ ও তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

এটি একটি গুণগত গবেষণা। তবে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কিছু পরিমাণগত তথ্যও উপস্থাপিত হয়েছে। গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎস থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্য যাচাই বাছাই ও বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদনে ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণাটিতে বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে তথ্য সংগ্রহের সীমা নির্ধারণে 'তথ্য সম্পৃক্তি'র (Data Saturation) বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে। গবেষণায় মাঠ পর্যবেক্ষণ এবং মুখ্য তথ্যদাতার স্বাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি, মানবিক সহায়তায় সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের কার্যক্রম সংক্রান্ত বিভিন্ন নথি, নিবন্ধসমূহ, ওয়েসাইট এবং গণমাধ্যম প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পাশাপাশি, প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহের জন্য রোহিঙ্গা আশ্রয়প্রার্থীদের ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক সংস্থা, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মুখপাত্র, ঐ এলাকায় কর্মরত সাংবাদিক ও আশ্রয়প্রার্থী রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর নাগরিকদের প্রতিনিধি মূখ্য তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। গবেষণায় সংগৃহীত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা নিশ্চিত করা রয়েছে। এক্ষেত্রে গুণগত গবেষণার পদ্ধতিসমূহ অনুসরণ করে একাধিক সূত্র হতে তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যসমূহের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা নিশ্চিত করা হয়। বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা অর্জনের জন্য একই ব্যক্তির একাধিকবার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। আশ্রয় শিবিরের প্রকারভেদে সব ধরনের শিবির (নিবন্ধিত, মেকশিফ্‌ট ও বিচ্ছিন্ন অবস্থান গ্রহণ) পর্যবেক্ষণ ও তথ্য সংগ্রহের জন্যে নির্বাচন করা হয়েছে। বাংলাদেশ সীমান্তে অনুপ্রবেশ থেকে শুরু করে আশ্রয়প্রার্থীদের অস্থায়ী শিবিরসমূহে আগমন প্রক্রিয়া বোঝার জন্যে স্থল ও জল উভয় ধরনের সীমান্ত নির্বাচন করা হয়েছে। সমীক্ষাটিতে চার সদস্যের একটি গবেষণা দল কাজ করেছে এবং রোহিঙ্গাদের সাক্ষাৎকার নেয়ার ক্ষেত্রে ভাষার প্রতিবন্ধকতা এড়ানোর জন্য রোহিঙ্গাদের ভাষা বোঝে এমন দুই জন তথ্য সংগ্রহকারী সার্বক্ষনিকভাবে তথ্য সংগ্রহে গবেষকদের সাথে কাজ করেছে। এই সমীক্ষাটি সেপ্টেম্বর ২০১৭ থেকে অক্টোবর ২০১৭ সময়কালে পরিচালিত হয়েছে।

৫. সমীক্ষার ফলাফল

৫.১ অংশীজনদের দায়িত্ব এবং সমন্বয়

সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও বেসরকারি সংস্থা আশ্রয়প্রার্থী মায়ানমারের নাগরিকদের (রোহিঙ্গা) মানবিক বিপর্যয় মোকাবেলার জন্য জরুরি ব্যবস্থা নিয়েছে এবং তা এখনো অব্যাহত আছে। সরকারি অংশীজনদের মধ্যে রয়েছে জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, পুলিশ বাহিনী, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, বন বিভাগ, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, পল্লী বিদ্যুৎ, সমাজ সেবা অধিদপ্তর, শরণার্থী, ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের কার্যালয়, স্বাস্থ্য বিভাগ, পরিবার

পরিকল্পনা অধিদপ্তর, খাদ্য অধিদপ্তর, ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগ ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর। এছাড়া জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থাসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে ইন্টার সেক্টর কোর্ডিনেশন গ্রুপ।

৫.২ সীমানা পারাপার এবং ক্যাম্পে আগমন

জল এবং স্থল উভয় পথেই বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত আশ্রয়প্রার্থী মায়ানমারের নাগরিকরা (রোহিঙ্গা) সীমানা অতিক্রম করে বাংলাদেশে প্রবেশ করছে। টেকনাফের শাহপরীর দ্বীপ, শামলাপুর, হ্নীলা, হোয়াইকং কানজরপাড়া, লেদা, উংচিপ্রাং; উখিয়ার আঞ্জুমানপাড়া, জামতলী এবং নাইক্ষংছড়ির ঘুমধুন ইউনিয়নের তমব্রু সীমান্তসমূহ মূলত এই অনুপ্রবেশে ব্যবহৃত হচ্ছে। জলপথে সীমানা পাড়ি দেয়ার জন্য মায়ানমারের নাগরিকদের ৫,০০০-১৫,০০০ টাকা নৌকার মাঝিকে প্রদান করতে হয়, নগদ টাকা না থাকলে নারীরা তাদের ব্যবহৃত স্বর্ণালঙ্কারের বিনিময়ে নদীপথ পাড়ি দেয়। বাংলাদেশে প্রবেশের পর তারা মূলত নীকটবর্তী সীমান্ত থেকে পায়ে হেঁটে এবং দূরবর্তী সীমান্ত থেকে স্থানীয় যানবাহন ব্যবহার করে কয়েক ধাপে ক্যাম্পগুলোতে পৌঁছাচ্ছে। পরিবহন ঠিক করার জন্য স্থানীয় জনসাধারণ, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) সহযোগিতা করে থাকে। এই যাত্রাপথে তারা তাদের সাথে নিয়ে আসা মায়ানমারের মুদ্রা বিনিময় করে বাংলাদেশী মুদ্রা সংগ্রহ করে থাকে। মুদ্রা সংগ্রহ করার সময় তারা মুদ্রার প্রকৃত মূল্য পায় না। মুদ্রা বিনিময়ের কোনো আইন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান স্থানীয় এলাকায় না থাকায় তারা মুদ্রা ক্রয় বিক্রয় কাজে নিয়োজিত একটি অবৈধ চক্রের কাছ থেকে বাংলাদেশী মুদ্রা সংগ্রহ করে। এক্ষেত্রে তারা ১ লক্ষ বার্মিজ মুদ্রার বিপরীতে ২,০০০-৪,৫০০ টাকা সংগ্রহ করতে পারে। অথচ আন্তর্জাতিক দর অনুযায়ী এর মান ৬,০০০ টাকা হওয়ার কথা। কোন ক্যাম্পে যাবে তা তারা মূলত নির্ধারণ করে থাকে তাদের আত্মীয়-স্বজন বা পরিচিত লোকজন কোন ক্যাম্পে উঠেছে তার উপর।

৫.৩ আশ্রয়স্থল

আশ্রয়স্থল বরাদ্দের কোনো আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি নেই, তবে সম্প্রতি সেনাবাহিনী নতুনভাবে আগতরা কোথায় আশ্রয়স্থল নির্মাণ করবে তা নির্ধারণ করে দিচ্ছে। যে যে ক্যাম্পে আসে সে ক্যাম্পের সন্নিহিত কোন পাহাড়ে পাহাড় কেটে রোহিঙ্গারা আবাসন তৈরি করে। ১২-১৮ বর্গফুট আয়তনের আশ্রয় শিবির/ঝুপড়ি তৈরিতে মূলত বাঁশ ও পলিথিন কভার ব্যবহার করা হচ্ছে যেখানে গড়ে ৫-৬ জন এর পরিবার বাস করে। অস্থায়ী ক্যাম্পগুলো মূলত বন বিভাগের জমিতে তৈরি হয়েছে। তবে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমিতেও কেউ আশ্রয় পেয়েছে। সেনাবাহিনী জড়িত হওয়ার পূর্বে স্থানীয় লোকজন রোহিঙ্গাদের কাছ থেকে জায়গার ভাড়া হিসেবে ৩,০০০-৫,০০০ টাকা আদায় করেছে। এর সাথে স্থানীয় জন প্রতিনিধির যোগসাজশ রয়েছে। ঝুপড়ি তৈরির সরঞ্জাম কেউ কেউ ত্রাণ হিসেবে পেয়েছে, কেউ কেউ স্থানীয় বাজার থেকে গড়ে ২০০০ টাকায় ক্রয় করেছে।

৫.৪ ত্রাণ ব্যবস্থাপনা

রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের প্রথম দিকে ত্রাণ ব্যবস্থাপনা ছিল বিচ্ছিন্ন এবং অপরিকল্পিত। অনেক ক্ষেত্রেই পূর্ব থেকে বসবাসরত রোহিঙ্গারা ত্রাণ গ্রহণের সুযোগ নিয়েছে কেননা কে নতুন কে পুরাতন তা চিহ্নিত করা সম্ভব ছিল না। অনেক ক্ষেত্রেই নারী ও বয়োবৃদ্ধরা ত্রাণ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। অনেক ত্রাণদাতা গাড়ি থেকে ভিড়ের মধ্যে ত্রাণের প্যাকেট ছুড়ে মেরেছে। দূর থেকে রান্না করা খাবার নিয়ে আসার কারণে খাবার পঁচে যেত। পরবর্তীতে জেলা প্রশাসনের সমন্বয়ে ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম শুরু হলে ত্রাণ বিতরণে বিদ্যমান বিশৃঙ্খলা কমে আসে। এর পাশাপাশি ইন্টার সেক্টর কোর্ডিনেশন গ্রুপও কাজ করছিল পরিস্থিতি উন্নয়নের জন্য। সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ ত্রাণ ব্যবস্থাপনায় জড়িত হওয়ার পর সম্পূর্ণ ব্যবস্থাপনাটি একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামোতে আসে। বর্তমানে জেলা প্রশাসন এবং সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ সমন্বয়ের মাধ্যমে ত্রাণ গ্রহণ ও বিতরণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়ারহাউজ এবং উখিয়া ডিগ্রী কলেজ মাঠে নির্মিত অস্থায়ী ওয়ারহাউজে ত্রাণসমূহ সংরক্ষণ করা হয়। ত্রাণের উৎসগুলো হচ্ছে ব্যক্তিগত উদ্যোগ, সরকারি উদ্যোগ, বিদেশী সংস্থা, জাতিসংঘের অঙ্গীভূত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, দেশী-বিদেশী আন্তর্জাতিক সংস্থা, বিভিন্ন দেশের সরকারের কাছ থেকে পাওয়া সহায়তা ইত্যাদি। বর্তমানে উখিয়া ও টেকনাফের ২৪টি বিতরণকেন্দ্রের মাধ্যমে সেনাবাহিনীর সহায়তায় ত্রাণ বিতরণ করা হচ্ছে। ত্রাণ বিতরণের আগে রোহিঙ্গা কমিউনিটির লিডারদের (মাঝি) সহায়তায় ত্রাণ বিতরণের তারিখ সম্বলিত টোকেন বিতরণ করা হয় । কিছু কিছু ক্ষেত্রে মাঝিদের বিরুদ্ধে ত্রাণের টোকেন বিক্রয়, ত্রাণ আত্মসাৎ, অন্য রোহিঙ্গাদের নিকট থেকে টাকা আদায়সহ নানাবিধ অপরাধ ও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। এসব অপরাধ ও দুর্নীতির ক্ষেত্রে মাঝিদের সাথে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ততার বিষয়টিও বার বার উঠে এসেছে। জেলা প্রশাসন এর উদ্যোগে খানাভিত্তিক একটি রিলিফ কার্ড বিতরণ করা হচ্ছে। এর বিতরণ কাজ সম্পন্ন হলে সমগ্র ত্রাণ বিতরণ প্রক্রিয়ায় পরিপূর্ণ শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

৫.৫ খাদ্য

২০১৭ এর ২৫ আগষ্টের পর নতুনভাবে আসা প্রায় ৫ লক্ষাধিক আশ্রয়প্রার্থীর জন্য জরুরি খাদ্য সহায়তা প্রয়োজন ছিল। এছাড়াও দেড় লক্ষাধিক ৫ বছরের কম বয়সী শিশু এবং ৫৫ হাজারের অধিক গর্ভবতী নারীর জন্য প্রয়োজন ছিল পুষ্টি সহায়তা। ১৫ অক্টোবর, ২০১৭ পর্যন্ত পাওয়া তথ্যানুযায়ী- এ পর্যন্ত ৫,৩৬,০০০ জন আশ্রয়প্রার্থীর খাদ্য সরবরাহ সম্ভব হয়েছে। এর মধ্যে ৩,৬২,৮৯৫ জন পূর্ণ দিনের খাবার সরবরাহের আওতায় আছে এবং বাকিদের শুধু পর্যাপ্ত চাল বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও ১২,৬৬২ জন গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী নারী এবং ৪৯,৩০৬ জন পাঁচ বছরের নিচের শিশুকে সম্পূরক খাদ্য প্রদান করা হয়েছে। ইন্টার সেক্টর কোর্ডিনেশন গ্রুপ (আইএসসিজি)- এর পক্ষ থেকে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী (ডাব্লিউএফপি) জরুরি খাদ্য সরবরাহে নেতৃত্ব দেয়, এর পাশাপাশি এসিএফ, সেড, রেডক্রস, পালস বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশি ও আন্তর্জাতিক সংস্থা জরুরি খাদ্য সহায়তা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

৫.৬ বস্ত্র

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী তাদের নিজস্ব ধরনের পোশাক ছাড়া অন্য কিছু পড়তে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না, যার ফলে প্রথমদিকে দানকৃত শার্ট, প্যান্ট ও শাড়ী ইত্যাদি পোশাক, বিশেষ করে ব্যবহৃত পুরোনো পোশাক রোহিঙ্গারা ব্যবহার করেনি। অনেকগুলোই উখিয়া টেকনাফ সড়কের বিভিন্ন স্থানে ফেলে দেয়া হয়েছে। পরবর্তীতে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে তাদের নিজস্ব ধরনের পোষাক তথা থামি, লুঙ্গি সরবরাহ করা হয়। সরকারি ওয়ারহাউজে লুঙ্গি, থামি, গামছা, শিশুদের পোশাক স্বল্প পরিমাণে সংরক্ষিত আছে।

৫.৭ পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন

নতুন আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গা আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য প্রতিদিন ৫৮ মিলিয়ন লিটারের অধিক নিরাপদ পানি প্রয়োজন সে তুলনায় যোগানের ঘাটতি রয়েছে। জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং দেশী বিদেশী বিভিন্ন সংস্থার উদ্যোগে রোহিঙ্গা আবাসনগুলোতে নলকূপ এবং স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপনের স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। অতিরিক্ত ব্যবস্থা হিসেবে সেনাবাহিনী, জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশল অধিদপ্তর, এসিএফ ভ্রাম্যমাণ ওয়াটার রিজার্ভারের মাধ্যমে পানি বিতরণ করছে। যেসব ক্যাম্পে নিরাপদ পানি অধিক দুষ্প্রাপ্য সেখানে সেনাবাহিনী ৩৭ ওয়াটার ট্রেইলার এবং দুটি ব্রাউজারের মাধ্যমে পৌছে দিচ্ছে। পাশাপাশি অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে জীবানুমুক্ত করার জন্য ২০০০ কেজি ব্লিচিং পাউডার ছিটানো হয়েছে। ২৯ অক্টোবর, ২০১৭ পর্যন্ত পাওয়া তথ্যানুযায়ী- এ পর্যন্ত ৪,৩৭০টি নলকূপ এবং ২৪,৭৭৩টি স্যানিটারি টয়লেট স্থাপন করা য়েছে। তবে পর্যাপ্ত তদারকি না থাকায় বিভিন্ন জায়গায় বসানো নলকুপ নষ্ট হয়ে অকেজো পড়ে থাকতে দেখা গেছে। অস্থায়ীভাবে নির্মিত এসব স্যানিটারি ল্যাট্রিন ২-৩ রিং বিশিষ্ট হওয়ায় খুব দ্রুত ভরাট হয়ে যাবে কিন্তু এখন পর্যন্ত বর্জ্য অপসারণের কোনো ব্যবস্থার কথা চিন্তা করা হয় নি। ফলে অল্প সময়েই এসব ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে যাবে। গভীরতা কম হওয়ায় নলকূপগুলোও শুষ্ক মৌসুমে অকেজো হয়ে যাবে।

৫.৮ স্বাস্থ্যসেবা

স্বাস্থ্য বিভাগের সমন্বয়ে ক্যাম্প পর্যায়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, এবং ক্রিটিক্যাল পরিস্থিতির জন্য উখিয়া- টেকনাফের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, জেলা সদর হাসপাতাল কক্সবাজার এবং চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রোহিঙ্গাদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। সিভিল সার্জনের অফিসের সমন্বয়ে মাঠপর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে। বিভিন্ন বেসরকারি এবং বিদেশী সংস্থা মাঠপর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছে। সরকারি বেসরকারি উদ্যোগে ভ্রাম্যমাণ স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে ক্যাম্পগুলোতে। সরকারি উদ্যোগে প্রশিক্ষিত ধাত্রীরা খানা পর্যায়ে প্রসূতি সেবা নিশ্চিত করছে। অপুষ্টিতে ভোগা গর্ভবতী, দুগ্ধবতী নারী এবং শিশুদের জন্য বেশ কিছু উদ্যোগ রয়েছে, বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় তাদের জন্য মানসিক স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থাও রয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বিভিন্ন ভ্যাকসিন সরবরাহ করছে। হাম-রুবেলা, পোলিও ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে। ১৫ অক্টোবর, ২০১৭ পর্যন্ত পাওয়া তথ্যানুযায়ী- ২৫ আগস্ট ২০১৭ থেকে এ পর্যন্ত ২,৭১,৭২৯ জনকে নানাবিধ স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে, ৯ মাস থেকে ১৫ মাস বয়সী ১,৩৫,৫১৯ জন শিশুকে হাম ও রুবেলা ভ্যাক্সিন এবং শূন্য থেকে ৫ বছর বয়সী ৭২,৩৩৪ জন শিশুকে পোলিও ভ্যাক্সিন ও 'ভিটামিন এ' ক্যাপসুল প্রদান করা হয়েছে। ১০ অক্টোবর কলেরা ভ্যাক্সিন ক্যাম্প চালু করা হয়েছে, ৭৬,৯৩১ জন নারী 'সেক্সুয়াল এন্ড রিপ্রোডাক্টিভ' স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ করেছে, ৮৪,৬৪৩ জন মানসিক এবং মনস্তাত্ত্বিক সেবা গ্রহণ করেছে।

৫.৯ প্রতিবন্ধী, অনাথ এবং শিশুদের জন্যে গৃহীত বিশেষ ব্যবস্থা

অনাথ রোহিঙ্গা শিশুদের আলাদা ক্যাম্পে রাখার পরিকল্পনা করেছে সরকার। ২০ অক্টোবর, ২০১৭ পর্যন্ত সমাজসেবা অধিদপ্তর চারটি প্রকারভেদে সর্বমোট ১৮,৪৪৯ জন অনাথ শিশুকে চিহ্নিত ও তালিকাভুক্ত করেছে। এর মধ্যে রয়েছে- যারা বাবা-মা উভয়কে হারিয়েছে, যারা শুধু বাবা হারিয়েছে, যারা শারিরীকভাবে প্রতিবন্ধী এবং হারিয়ে যাওয়া শিশু। তালিকাভুক্তির কাজটি এখনো চলমান। তালিকা শেষে সরকার শিশুপল্লী স্থাপনের উদ্যোগ নিবে। প্রতিবন্ধীদের জন্য সংবেদনশীল কোনো ব্যবস্থাপনা বা স্থাপনা এখনো পর্যন্ত

করা হয়নি শিশুদের বিনোদনের জন্যে ইউনিসেফ এবং সহযোগী বেসরকারি সংস্থার সহায়তায় বিভিন্ন স্থানে কিছু সংখ্যক শিশুবান্ধব কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে, তবে তা মোট শিশুর সংখ্যার তুলনায় খুবই অপ্রতুল।

৫.১০ নিরাপত্তা

সারাদেশে রোহিঙ্গাদের ছড়িয়ে পড়া রোধ করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা দেশের বেশ কয়েকটি জেলা থেকে রোহিঙ্গাদের আটক করেছে। ০৮ অক্টোবর, ২০১৭ পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী ৬৯০ জন রোহিঙ্গাকে সারাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আটক করে ক্যাম্প এলাকায় ফেরত পাঠানো হয়েছে এবং ক্যাম্প এলাকা থেকে অন্য জেলায় যাওয়ার সময় প্রায় ২৫,০০০ জনকে আটক করা হয়েছে। সারাদেশে রোহিঙ্গা'র বিস্তার আটকাতে পুলিশ কক্সবাজার জেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়কে ১১টি চেক পয়েন্ট স্থাপন করেছে। সার্বিক নিরাপত্তা বজায় রাখতে কক্সবাজারের ১৬০০ সদস্যবিশিষ্ট পুলিশ বাহিনীর পাশাপাশি চট্টগ্রাম রেঞ্জ থেকে অতিরিক্ত ৬৬৭ জন পুলিশ সদস্য কাজ করছে। পুলিশের পাশাপাশি আর্মড ফোর্সেস ডিভিশনের সদস্য এবং বিজিবি সদস্যরাও বিভিন্ন পয়েন্টে আলাদা আলাদা চেক পোস্ট স্থাপন করেছে। পুলিশ, আর্মড ফোর্সেস ডিভিশন, এবং বিজিবির আলাদা আলাদা চেকপোস্ট অতিক্রম করে রোহিঙ্গাদের অন্যত্র সরে যাওয়া বর্তমানে অনেকটাই কঠিন। ক্যাম্পের ভেতরে অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা নিরাপদ রাখার জন্য ক্যাম্পেও নৈশ টহলের ব্যবস্থা রয়েছে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় সব ধর্মের প্রতিনিধিদের নিয়ে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম করছে পুলিশ। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয় ফোনে কলের জন্য বিভিন্ন ত্রাণ বিতরণ কেন্দ্রে ১০টি টেলিটকের বুথ বসানো হয়েছে। এখান থেকে রোহিঙ্গা নাগরিকরা গুরুত্বপূর্ণ টেলি-যোগাযোগ বিনা খরচে করতে পারে।

৫.১১ বায়োমেট্রিক নিবন্ধন

রোহিঙ্গা নাগরিকদের নির্ভূলভাবে সনাক্ত করার লক্ষ্যে সরকার সকল রোহিঙ্গা নাগরিকের বায়োমেট্রিক রেজিস্ট্রেশনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। পাসপোর্ট অধিদপ্তরের তত্তাবধানে এ নিবন্ধনের কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছে। বায়োমেট্রিক কাজের জন্য পাসপোর্ট অধিদপ্তরকে সহায়তা করছে বিজিবি। তারা অপারেটরের কাজ করছে। মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবীরা রোহিঙ্গাদের বায়োমেট্রিক নিবন্ধনের জন্য উদ্বুদ্ধ করছে। ইউএনএইচসিআর তাদের অবকাঠামো ব্যবহার করার সুযোগ দিচ্ছে। ফায়ার সার্ভিস বিদ্যুৎ সরবরাহ নিরবিচ্ছিন্ন রাখার জন্য জেনারেটর সাপোর্ট দিচ্ছে। এ পর্যন্ত সর্বমোট সাতটি রেজিস্ট্রেশন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। যেকোনো রোহিঙ্গা নাগরিক রেজিস্ট্রেশন কেন্দ্রে আসলেই তাদের প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করে খুব দ্রুত নিবন্ধন কাজ সম্পন্ন হয়। নিবন্ধন কেন্দ্রে আলাদা আলাদা লোকজন আগত রোহিঙ্গাদের আঙ্গুলের ছাপ-ছবি নিচ্ছে, তারপর তা প্রিন্টিংএ চলে যায়, প্রিন্টিং এর পর লেমিনিটিং করে রোহিঙ্গাদের কাছে হস্তান্তর করা হচ্ছে। পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে ৫-১০ মিনিট সময় লাগে। **২৮** অক্টোবর ২০১৭ পর্যন্ত **৩,১৩,০০০ জন** রোহিঙ্গার নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে।

৬. সামগ্রিক ব্যবস্থার ইতিবাচক দিকসমূহ

বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সংকট মোকাবেলায় সমগ্র ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের আন্তরিক উদ্যোগ রয়েছে। বিভিন্ন সরকারি সংস্থা ও বাহিনীগুলো নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষত পুরো ব্যবস্থাপনা সমন্বয়ের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক ও তার কার্যালয়ের ভূমিকা প্রশংসনীয়। পুরো বিষয়টির সুষ্ঠু ব্যাবস্থাপনার জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রয়োজন অনুযায়ী অতিরিক্ত জনবল মোতায়েন করেছে। ত্রাণ বিতরণ, জরুরি স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, পানীয় জলের ব্যবস্থাপনা ও পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা প্রদানের কাজে নিয়োজিত সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ আন্তরিকভাবে কাজ করছে। আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ ও আইএসসিজি এই জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করছে। বিভিন্ন সংস্থাসমূহের মধ্যে নিয়মিত সমন্বয়ের উদ্যোগ রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও দপ্তরসমূহ থেকে সরাসরি মাঠ পরিদর্শন করা হচ্ছে। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো থেকেও মাঠ পরিদর্শন করা হচ্ছে। সকল অংশীজনের কার্যক্রমে রোহিঙ্গা আশ্রয়প্রার্থীদের প্রতি সংবেদনশীলতা লক্ষ করা গেছে। রাষ্ট্রীয় ত্রাণসহ বেসরকারি সংস্থার ত্রাণসমূহের পূর্ণ তথ্যাবলী জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে উন্মুক্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন ওয়ারহাউজে সংরক্ষিত ত্রাণ সমূহের বিস্তারিত বিবরণ জেলা প্রশাসনের কাছে রয়েছে। ইন্টার সেক্টর কোর্ডিনেশন গ্রুপ নির্দিষ্ট বিরতিতে 'সিচুয়েশন রিপোর্ট' এবং অন্যান্য তথ্যাবলী প্রকাশ ও উন্মুক্ত করছে। স্থানীয় অধিবাসীদের ও সমগ্র দেশ থেকে স্বপ্রণোদিত হয়ে আশ্রয়প্রার্থীদের জন্যে আন্তরিকভাবে বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। শিশুদের বিনোদনের জন্যে ইউনিসেফ এবং সহযোগী সংস্থাগুলো বিভিন্ন স্থানে কিছু শিশু-কেন্দ্র তৈরি করেছে এবং স্থাপিত কেন্দ্রগুলোর মান সন্তোষজনক, তবে অপর্যাপ্ত।

৭. চ্যালেঞ্জসমূহ

৭.১ সীমানা অতিক্রম, মুদ্রা বিনিময়, অবস্থান ও আশ্রয় নির্মাণ

- সীমান্ত অতিক্রম পথগুলো নিয়ন্ত্রনে কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি এবং সেখানে মাদক ও আগ্নেয়াস্ত্র পাচার রোধে নিরাপত্তা তল্লাশী এবং কোনো ধরনের জরুরি সেবার ব্যবস্থা নেই। যাত্রাপথে আহত ব্যক্তিদের ক্যাম্পে পৌঁছানোর পর জরুরি চিকিৎসা নিতে হয়েছে
- সীমান্ত অতিক্রম থেকে আশ্রয়স্থলে পৌঁছানো এবং আশ্রয় শিবির তৈরি পর্যন্ত রোহিঙ্গারা বিভিন্ন অসাধু চক্রের হাতে ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে প্রতারণা ও চাঁদাবাজির শিকার হয়:

  - **নৌকায় সীমান্ত পার হওয়ার ক্ষেত্রে,** *মায়ানমারের নৌকার মাঝিদের জনপ্রতি গড়ে ৫,০০০-১৫,০০০ টাকা অথবা সোনার গহনা দিতে হয় (প্রকৃত ভাড়া ২০০-২৫০ টাকা)*

  - **মুদ্রা বিনিময়ের ক্ষেত্রে,** *প্রতি এক লক্ষ কিয়াটে ৬,০০০ টাকা প্রদানের কথা থাকলেও দালালদের কাছ থেকে তারা পাচ্ছে ২,০০০-৪,৫০০ টাকা*

  - **স্থানীয় যানবাহন ব্যবহারে;** *অতিরিক্ত ভাড়া প্রদান করতে হয়েছে (বাংলাদেশী মুদ্রার মান জানা না থাকায়)*

  - **আশ্রয়ঘর নির্মাণের ক্ষেত্রে,** *প্রতিটি পরিবারকে গড়ে ২,০০০-৫,০০০ টাকা দিতে হয়েছে একটি অসাধু চক্রকে*
- উল্লেখ্য, উপরিউক্ত প্রতিটি ধাপের প্রতারণার সাথেই স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ পাওয়া গেছে
- বৈদেশিক সহায়তা থেকে প্রদত্ত তাবুঁগুলো মূলত শীতপ্রধান দেশের উপযোগী হওয়ায় রোহিঙ্গারা সেগুলোতে থাকতে পারছে না। তারা তাদের বাঁশ ও পলিথিনের ঝুপড়িঘরেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে
- আশ্রয় ঘরগুলো দুর্যোগসহনশীল (ঘূর্ণিঝড়, অতিবৃষ্টি, ভূমিধ্বস) নয় এবং ঘনসন্নিবেশিত হওয়ায় দূর্ঘটনায় আগুন লাগলে ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে

৭.২ ত্রাণ ব্যবস্থাপনা ও জীবন ধারণে সহায়তা (খাদ্য, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, পানিও পয়ঃনিষ্কাশন)

- রোহিঙ্গাদের কোনো পূর্ণাঙ্গ তালিকা না থাকায় ত্রাণ বিতরণসহ অন্যান্য সহায়তার ক্ষেত্রে সমতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি
- কোনো কোনো ক্ষেত্রে 'মাঝি'-দের ত্রাণের টোকেন বিক্রয়, ত্রাণ আত্মসাৎ, রোহিঙ্গাদের কাছ থেকে টাকা আদায়সহ নানাবিধ অপরাধ ও দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে এবং মাঝিদের সাথে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ততার অভিযোগ পাওয়া গেছে
- শীত ও বর্ষা মৌসুমে উপযুক্ত পোশাকের (বিশেষত শিশু এবং গর্ভবর্তী নারীদের ক্ষেত্রে) অপর্যাপ্ততা একটি সম্ভাব্য স্বাস্থ্য ঝুঁকি
- নিরাপদ খাবার পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার এখনো ব্যাপক অপ্রতুলতা রয়েছে। এ সংক্রান্ত যে সকল স্থাপনা তৈরি করা হয়েছে তার তদারকি ব্যবস্থায় ঘাটতি রয়েছে। স্থাপিত নলকূপগুলোর ৩০% দ্রুত প্রতিস্থাপন/মেরামত করা প্রয়োজন
- উপযুক্ত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার অভাব বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাবের ঝুঁকি সৃষ্টি করেছে। তাছাড়া প্রদত্ত অস্থায়ী টয়লেটগুলোর ৩৬% নিকট ভবিষ্যতে ভরাট হয়ে যাবে
- চাহিদার তুলনায় স্বাস্থ্যসেবা যথেষ্ট অপ্রতুল এবং তার উপর যোগ হয়েছে বিভিন্ন পানিবাহিত ও সংক্রামক রোগের ঝুঁকি। রোহিঙ্গা নারী রোগিদের প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার জন্য পুরুষ ডাক্তারদের নিকট হতে চিকিসা নিতে সংকোচ বোধ করে, কিন্তু পর্যাপ্ত নারী চিকিৎসকের ঘাটতি রয়েছে। তাছাড়া রোহিঙ্গাদের মধ্যে এইড্স- এ আক্রান্ত রোগী পাওয়া গেছে যা বাংলাদেশের জন্য একটি নতুন চ্যালেঞ্জ
- আইএসসিজি কর্তৃক সামগ্রিক কাজের হালনাগাদ তথ্য নির্দিষ্ট বিরতিতে 'সিচুয়েশন রিপোর্ট' হিসেবে প্রকাশ করা হলেও প্রতিষ্ঠানভিত্তিক কার্যক্রমের বিস্তারিত তথ্য (পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যতীত) উন্মুক্ত নেই
- প্রতিনিয়ত সরকারি ও বৈদেশিক গুরুত্বপূর্ণ অতিথিদের প্রোটোকল প্রদানে জেলা প্রশাসন ব্যস্ত থাকার কারণে ত্রাণ ব্যবস্থাপনার সার্বিক তদারকিতে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্যে পর্যাপ্ত সময়ের ঘাটতি রয়েছে

৭.৩ নিরাপত্তা, নিবন্ধন ও অভিযোগ নিরসন

- রাস্তা থেকে ক্যাম্পের ভেতরে পৌঁছানোর জন্য সংযোগ সড়ক নির্মাণের কাজ শেষ না হওয়ায় ক্যাম্পের ভেতরের নিরাপত্তা (বিশেষ করে রাতে) ব্যবস্থায় অপ্রতুলতা রয়ে গেছে
- সামগ্রিকভাবে এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থা গড়ে উঠেনি এবং রোহিঙ্গাদের নিজেদের মধ্যে এবং রোহিঙ্গাদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধের (হত্যা, ধর্ষণ প্রভৃতি ব্যতিত) নিরসনের আইনি প্রক্রিয়া এখনো নির্ধারণ করা হয়নি

- বায়োমেট্রিক নিবন্ধন প্রক্রিয়াতে লোকবলের ও নিবন্ধন কেন্দ্রের সংখ্যার অপর্যাপ্ততা রয়েছে। রোহিঙ্গাদের মাঝে এই নিবন্ধনের ধারণা পরিষ্কার নয়, বরং কিছু ক্ষেত্রে ভুল ও নেতিবাচক ধারণা লক্ষ করা গেছে এবং কার্যরত কোনো কোনো বেসরকারি সংস্থাসমূহ কর্তৃক নিবন্ধনে নিরুৎসাহিত করার অভিযোগ পাওয়া গেছে
- রোহিঙ্গাদের একাংশের (বিশেষত মাঝিদের) কাছে মোবাইল সেট ও রবি সিম দেখা গেছে যা আইনত অবৈধ

৭.৪ পরিবেশগত প্রভাব ও বিপর্যয়

- আশ্রয়ঘরগুলো তৈরির সময় পাহাড় কাটা ও বনভূমির উজাড় এ অঞ্চলের জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি এবং পরিবেশগত বিপর্যয়ের ঝুঁকি তৈরি করেছে। তাছাড়া বন্য হাতির গমনপথে আশ্রয়ঘর তৈরি করায় একটি বাড়তি ঝুঁকি তৈরি হয়েছে
- জ্বালানী কাঠ স্থানীয় গাছপালা থেকে সংগ্রহ করার দরুন বনায়নের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে
- এখনো পর্যন্ত পরিবেশ অধিদপ্তরের এ বিষয়ে কোন কর্মসূচী নেই

৮. চলমান ও দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব

ত্রাণ ও জীবনধারণে সহায়তা (খাদ্য, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন)

- আন্তর্জাতিক সহায়তায় ত্রাণ সরবরাহ এবং এর পর্যাপ্ততা নিশ্চিত করা সম্ভব না হলে দীর্ঘমেয়াদে বাংলাদেশের পক্ষে এই বিপুল জনগোষ্ঠীর জীবন ধারণের সহায়তা প্রদান অনিশ্চিত হবে
- দ্রুত পূর্ণাঙ্গ তালিকা সম্পন্ন করে ত্রাণ বিতরণে সমতা নিশ্চিত না করলে আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেবে এবং সার্বিক ব্যবস্থাপনাটি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে যা সহিংসতায় পরিণত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে

নিরাপত্তাজনিত

- পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত না করা হলে ক্যাম্পগুলোতে নানাবিধ অপরাধ ও সহিংসতা বৃদ্ধি পাবে (বিশেষত নারী ও শিশুদের প্রতি)। এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী মহল কর্তৃক নানাবিধ অপরাধে (যেমন, মাদক চোরাচালান, হত্যা, লুটপাট ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ড) রোহিঙ্গাদের জড়িত হবার ঝুঁকি রয়েছে
- রোহিঙ্গা সংকটটি পুরো পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে স্থিতিশীলতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে আসতে পারে। তাছাড়া এই সংকটের সুযোগ নিয়ে অত্র এলাকার বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনসমূহের সাথে রোহিঙ্গাদের যোগসাজশ প্রতিষ্ঠার ঝুঁকি রয়েছে
- রোহিঙ্গারা বাংলাদেশের অন্যান্য জেলাসমূহে ছড়িয়ে গেলে তা বহুমুখী সামাজিক, অর্থনৈতিক ও জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত দীর্ঘমেয়াদী ঝুঁকির কারণ হবে
- রোহিঙ্গাদের মধ্যে সাংগঠনিক ক্ষমতা কাঠামো তৈরি হচ্ছে যা শুরু থেকে নিয়ন্ত্রণ করা না হলে একটি জটিল ও দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা হিসেবে পরিণত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে
- অবাধ সীমান্ত অতিক্রমের সুযোগ ব্যবহার করে মাদক চোরাচালান ও মানব পাচারসহ বিভিন্ন ঝুঁকি উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে

পরিবেশ

- রোহিঙ্গাদের অবস্থানরত অঞ্চলে ধ্বংস হওয়া পাহাড় কাটা, বনভূমির উজাড় ও অপ্রতুল পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাজনিত কারণে ব্যাপক পরিবেশগত বিপর্যয় ঘটেছে যা অত্র অঞ্চলের জীববৈচিত্রের জন্য দীর্ঘমেয়াদী ঝুঁকির কারণ হয়ে দাড়িয়েছে

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রায় প্রভাব

- রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ ও স্থান গ্রহণ স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, যেমন- দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক উর্ধ্বগতি, কর্মসংস্থানের সুযোগ হ্রাস, যোগাযোগ ব্যয় বৃদ্ধি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসহ সহ নানাবিধ সেবার স্থবিরতা, মান ও অভিগম্যতার অবনতি। তাছাড়া উখিয়া ও টেকনাফে অবস্থানরত রোহিঙ্গাদের সংখ্যা স্থানীয় বাংলাদেশীদের তুলনায় দ্বিগুনেরও অধিক (স্থানীয় বাংলাদেশি জনসংখ্যা ৪,৭৫,০০০ ও রোহিঙ্গা জনসংখ্যা প্রায় ১০,০০,০০০)। দীর্ঘমেয়াদে এই পরিস্থিতি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা ও উন্নয়নে নেতিবাচক প্রভাব ফেলার সম্ভাবনা রয়েছে

জাতীয় উন্নয়নে প্রভাব

- রোহিঙ্গা ব্যবস্থাপনার বিষয়টি সরকার ও উন্নয়ন সংস্থাগুলোর জন্য বাড়তি চাপ হিসেবে আসায় বাংলাদেশের অন্যান্য বিপন্ন এলাকা ও জনগণের (হাওড় ও উত্তরাঞ্চলের বন্যাদুর্গত) পুনর্বাসন ও উন্নয়ন প্রচেষ্টা ব্যাহত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে
- রোহিঙ্গাদের ব্যবস্থাপনা ব্যয় (জাতীয়) সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতি এবং উন্নয়নে বিরূপ প্রভাব ফেলার ঝুঁকি রয়েছে

- রোহিঙ্গাদের অবস্থানরত অঞ্চলে পর্যটন শিল্প ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে

৯. সুপারিশসমূহ

মায়ানমার সামরিক বাহিনী কর্তৃক সম্প্রতি সময়ে মায়ানমারের রাখাইন রাজ্যের অধিবাসী রোহিঙ্গা জাতিগোষ্ঠীর উপর পরিচালিত জাতিগত নিধনমূলক অভিযানের ফলে সৃষ্ট ব্যাপক মানবিক সংকট মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকার, এদেশের সাধারণ মানুষ, জাতিসংঘ এবং মানবিক সংগঠনগুলোর নেয়া তড়িৎ ও সমন্বিত উদ্যোগ এই জরুরী পরিস্থিতিতে সামগ্রিকভাবে প্রশংসনীয়। স্বল্পতম সময়ে এত বিপুল সংখ্যক আশ্রয়প্রার্থীর চাপ এবং তাদের জন্য প্রয়োজনীয় মানবিক সহায়তা নিশ্চিত করা বাংলাদেশ সহ সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সহযোগীদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এই সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় টিআইবি নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ প্রদান করছে-

বাংলাদেশের সরকারের জন্য

১. উদ্ভুত রোহিঙ্গা সমস্যাটি যাতে একটি সুদীর্ঘ প্রক্রিয়ায় আবদ্ধ না হয়ে পড়ে সেই লক্ষ্যে অবিলম্বে প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সম্পৃক্ত করে বহুমুখী কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার করতে হবে

২. রোহিঙ্গা ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক ব্যয় প্রাক্কলন করে তা নির্বাহে আন্তর্জাতিক সহায়তা নিশ্চিতকরণে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। উক্ত প্রাক্কলনে সংশ্লিষ্ট খাতে বিশেষজ্ঞদের সম্পৃক্ত করে সার্বিক প্রশাসনিক, আইন প্রয়োগ ও সেবা খাতের ওপর সকল প্রকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব বিবেচনায় নিতে হবে

আন্তর্জাতিক সংস্থা, রাষ্ট্র ও দাতা সংস্থাসমূহের জন্য

৩. রোহিঙ্গা সমস্যাটি একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা। বাংলাদেশ মানবিক কারণে রোহিঙ্গাদের সাময়িক আশ্রয় প্রদান করলেও এর সমাধানে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে (প্রতিবেশী ভারত ও চীনসহ মায়ানমারের সাথে বিশেষ কূটনৈতিক, ব্যবসা, বিনিয়োগ, অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষা সম্পর্ক রয়েছে এমন সকল দেশ ও জাতিসংঘসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকে) এগিয়ে আসতে হবে এবং রোহিঙ্গাদের দ্রুত প্রত্যাবর্তন নিশ্চিতে মায়ানমারের ওপর সমন্বিত কূটনৈতিক প্রভাব, বিশেষ করে অবরোধ আরোপসহ সুনির্দিষ্ট চাপ প্রয়োগ করতে হবে

৪. যতক্ষণ পর্যন্ত মায়ানমারের নাগরিকদের প্রত্যাবর্তন সম্ভব না হয় ততদিন পর্যন্ত তাদের ত্রাণ ও অন্যান্য সহায়তা কার্যক্রমের ব্যয়সমূহ যৌথ অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে নির্বাহ করতে হবে

ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য

৫. পর্যাপ্ত লোকবল সরবরাহের মাধ্যমে যত দ্রুত সম্ভব সকল রোহিঙ্গার বায়োমেট্রিক নিবন্ধন সম্পন্নকরণ এবং প্রয়োজনে এ বিষয়ে উৎসাহ প্রদানের জন্য ত্রাণপ্রাপ্তির সঙ্গে এই নিবন্ধনের বাধ্যবাধকতা আরোপ করতে হবে

৬. সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ চাহিদা ও ঝুঁকি বিশ্লেষণমূলক সমীক্ষা পরিচালনা এবং সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ততা ও সমতা নিশ্চিত করতে হবে

৭. প্রতিবন্ধী ও অনাথ শিশুদের তালিকা দ্রুত সম্পন্নকরণ এবং তাদের জন্যে প্রয়োজনীয় বিশেষায়িত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে

৮. রোহিঙ্গা গর্ভবতী নারী ও সদ্য প্রসূতি মা ও নবজাতক শিশুর জন্য বিশেষ স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে হবে। রোহিঙ্গা পরিবারদের জন্মনিয়ন্ত্রণে উদ্বুদ্ধ করে বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে

৯. সীমান্ত অতিক্রম, মুদ্রা বিনিময়, অবস্থান গ্রহণসহ বিভিন্ন বিষয়ে যারা রোহিঙ্গাদের কাছ থেকে অনৈতিক সুবিধা গ্রহণ করেছে তাদেরকে যথাযথভাবে চিহ্নিত করে আইনি প্রক্রিয়ায় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে

১০. পুরো প্রক্রিয়ায় সার্বিকভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর তদারকি কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে হবে এবং নির্দিষ্ট বিরতিতে প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ করতে হবে

১১. রোহিঙ্গা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল সরকারি ও বেসরকারি বিস্তারিত তথ্য প্রকাশের জন্য একটি সমন্বিত ওয়েবসাইট তৈরি এবং নির্দিষ্ট সময়ের বিরতিতে তা হালনাগাদ করতে হবে

১২. সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সমন্বয়ে একটি কার্যকর অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে

১৩. পরিবেশ, বনায়ন ও জীববৈচিত্রের ক্ষতি রোধ ও তার পুনরুদ্ধারে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনদের সমন্বয়ে অনতিবিলম্বে একটি পরিকল্পনা ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে

১৪. রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে সীমান্তে প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত করা এবং এই অনুপ্রবেশের সুযোগে মাদক ও অন্যান্য দ্রব্যাদি চোরাচালানের ঝুঁকি প্রতিরোধক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে

১৫. ত্রাণের টোকেন বিতরণে সংঘটিত অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে

১৬. ক্যাম্প এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা (বিশেষ করে রাতে) জোরদার করতে হবে।